সংবাদ পরিষেবা | নভেম্বর ২০২২

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক, এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

## সরষের ভূত

২৮/২৩

**সুব্রত কুণ্ডু**

জিন পরিবর্তিত বা জিএম সরষে চাষে পরিবেশগত ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আগে বিটি তুলো চাষের অনুমোদন দিয়েছিল। এটাও ছিল জিএম ফসল। তারপর থেকেই জিএম বেগুন, সরষে, ধান ইত্যাদি খাদ্য ফসল চাষে ছাড়পত্র দেওয়ার চেষ্টা করেছে সরকার। বিটি তুলো চাষের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা যা আশঙ্কা করেছিল - তাই ঘটেছে। বোল ওয়ার্মের আক্রমণ তুলনায় কমলেও, অন্যান্য পোকার জন্য কীটনাশকের খরচ অনেক বেড়েছে। উৎপাদন তো বাড়েইনি। এখন কমতির দিকে। ফসলের বৈচিত্র কমেছে। বীজ কোম্পানি মনসান্টোর মুনাফা বেড়েছে। চাষের খরচ বেড়েছে। দেনার দায়ে চাষির আত্মহত্যা বেড়েছে। পরিবেশে, মানুষসহ অন্যান্য জীবের ওপরে জিএম তুলোর প্রভাব কতটা তা নিয়ে সরকারি সমীক্ষাও হয়নি। জিএম বেগুনের সময় আন্দোলনের চাপে সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য এই বীজের ছাড়পত্রের ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। এরপর থেকে নানা সময়ে, বিদেশি বীজ কোম্পানিগুলির চাপে, সরকারের নানা অংশ অনেক রকমভাবে জিএম ফসল ছাড়ের চেষ্টা করে গেছে।

অবশেষে, পরিবেশ মন্ত্রকের অধীনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রাইজাল কমিটি ১৮ অক্টোবর পরীক্ষা ও প্রদর্শনের জন্য ধারা সরষে হাইব্রিড (DMH-11) বীজের পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়ার পর, সরকার জিএম সরষের অনুমোদন দিয়েছে ৫টি রাজ্যে চাষের জন্য। রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং হরিয়ানার চাষিরা এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ৮ নভেম্বর, এই ফসল প্রত্যাহারের দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে একটি পিটিশন সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়েছে। সুপ্রিম কোর্ট সে মামলা গ্রহণ করেছে এবং প্রথমে ১০ নভেম্বর এবং পরে ১৭ নভেম্বর অবধি সরকারের এই সিদ্ধান্তের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে। সচেতন চাষি, স্বেচ্ছাসেবী, পরিবেশ কর্মী, বিজ্ঞানীরা জিএম ফসল একেবারে বয়কটের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রকৃতি থেকে দূরে, ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ায় জিন ফসল তৈরি করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় কোনো একটি জীবের নির্দিষ্ট গুণ সম্পন্ন জিন, সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ফসলের জিন সারণিতে বসিয়ে দেওয়া হয়। এতে ওই নির্দিষ্ট গুণ ফসলেও দেখা যায়। এখানে উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বিটি তুলোর কথা। ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস ব্যাকটোরিয়া যা বিটি টক্সিন তৈরি করে। এই টক্সিন তুলোর বোল ওয়ার্ম নামের পোকাকে প্রতিহত করে। তাই বিটি'র ওই জিন তুলোর জিন সারণিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। নাম দেওয়া হল বিটি তুলো। বলা হল, এই তুলো চাষ করলে পোকামাকড় লাগবে না। কীটনাশকের খরচ কমবে। চাষির লাভও বেশি হবে। পরে দেখা গেল এসবই বাগাড়ম্বর। কোম্পানির মুনাফার হাতিয়ার। এছাড়া জিএম উদ্ভিদ প্রকৃতিজাত নয়। তাই এই রবাহূত ফসলের কী প্রভাব প্রকৃতিতে পড়বে তা কেউ জানে না।

তবে এবারের বিরোধিতা এক অন্য মাত্রা পেয়েছে মৌমাছিপালক বা মৌচাষিদের আন্দোলনে। রাজস্থানের ভরতপুরে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচার রিসার্চ (আইসিএআর)- এর সরষে রিসার্চ ইনস্টিটিউটে মৌচাষিরা কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাদের কথায়, হাইব্রিড বীজ এবং বিটি-তুলোর চাষ ইতিমধ্যেই মৌমাছি এবং মধু উৎপাদনকে প্রভাবিত করেছে। আর জিএম সরষে চালু হলে মৌমাছির সংখ্যা একেবারে কমে যাবে। তাদের আরো বক্তব্য,

সরষেই একমাত্র প্রাকৃতিক ফসল যার ওপর এখন মৌচাষিরা নির্ভর করে। আগে তারা প্রায় আট মাস মধু সংগ্রহ করত। এখন তিন মাসও মধু পাওয়া যায় না। নতুন দিল্লি থেকে প্রকাশিত ডাউন টু আর্থ ওয়েবসাইট এই খবর জানাচ্ছে। মৌপালন ও মধুর জন্য চাষিরা সাধারণত সূর্যমুখী, তুলো, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, তিল, অড়হর, ছোলা ইত্যাদি ফসলের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু এইসব ফসলের হাইব্রিড বীজ চাষের ফলে, ফুলের দিনের সংখ্যা কমেছে। এতে মৌমাছির সংখ্যা এবং মধু উৎপাদনও কমেছে। আন্দোলনকারী চাষিদের কথায়, তাদের মধু আহরণের মরশুম এখন বছরে তিন মাসেরও কম হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, ভারত একটি প্রধান মধু রফতানিকারী দেশ। আর সব থেকে বেশি উৎপাদন এবং রফতানি হয় সরষের মধু। মৌচাষিরা বলেছেন, বিটি-তুলো চাষে মধু উৎপাদন কমেছে। আগে যেখানে তুলোর মরশুমে দুবার মধু সংগ্রহ হত। এখন একবার হয়। জিএম সরষের ক্ষেত্রেও এ ঘটনা ঘটবে না এটা কে বলবে! আর তাই মৌমাছির জনসংখ্যার ওপর বৈজ্ঞানিক প্রভাব না জেনে সরকার কীভাবে একটি জিএম ফসল অনুমোদন করতে পারে?

ভারতে প্রায় ২০ কোটি মৌমাছির কলোনি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে যা ফলন বাড়াতে সাহায্য করে এবং জীবিকার সংস্থান করে। প্রায় ২৫ লক্ষ চাষি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য মৌমাছির ওপর নির্ভরশীল। জিএম সরষে চাষের ফলে মৌপালন সরাসরি প্রভাবিত হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছে অনেকেই।

ভারত থেকে যে মধু রফতানি হয় তার প্রায় সবটাই সরষের মধু। এই মধু দ্রুত জমে, যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দেশগুলিতে এটি জনপ্রিয়। এই দেশগুলির লোকেরা জিএম-মুক্ত মধু চায়। কিন্তু জিএম সরষে চাষ বাণিজ্যিকভাবে অনুমোদিত হলে দেশে মৌপালন প্রায় বন্ধই হয়ে যেতে পারে।

মতামত নিজস্ব

## বেড়েই চলেছে তাপমাত্রা ২৮/২৪

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের ২৭তম কনফারেন্স অফ পার্টিস বা কপ-২৭ মিশরের শারম-এল-শেখ-এ ৬ নভেম্বর শুরু হয়েছে। এর উদ্বোধনে ওয়ার্ল্ড মেটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন (ডব্লিউএমও) 'স্টেট অফ দ্য গ্লোবাল ক্লাইমেট ইন ২০২২' রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এখানে বলা হয়েছে, গত ৮টি বছর ছিল পৃথিবীর উষ্ণতম বছর। জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের জন্য নির্গত গ্রিন হাউস গ্যাস এর কারণ। ডব্লিউএমও'র অনুমান ২০২২ সালে, ১৮৫০-১৯০০ সালের প্রাক শিল্প বিপ্লবের গড় তাপমাত্রা থেকে, বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা ১.২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে।

রিপোর্টে অনুমান করা হয়েছে যে, ২০১৩-২০২২ এই দশ বছরে, প্রাক-শিল্প বিপ্লবের সময়ের থেকে তাপমাত্রা সর্বাধিক ১.২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। এখানে বলা হয়েছে, গত ২০ বছরের তুলনায় ২০২১ সালে সমুদ্রের তাপ সবথেকে বেশি ছিল। এছাড়া ১৯৯৩ সাল থেকে শুরু করে গত ৩ দশকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা দ্বিগুণ হয়েছে। ২০২০ সাল অবধি এই উচ্চতা প্রতিবছর গড়ে ১০ মিলিমিটার করে বেড়েছে। প্রতিবেদনে আরো দেখানো হয়েছে, ২০২২ অর্থাৎ এই বছরে আল্পস পর্বতের হিমবাহতে বড় ক্ষত দেখা গেছে যা ব্যাপকভাবে বরফ গলে যাওয়ার প্রাথমিক ইঙ্গিত।

## জলবায়ু বদলঃ ভুগছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ২৮/২৫

২০২২ সালে জলবায়ু বদলে সব থেকে ক্ষতি হয়েছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে। ওয়ার্ল্ড মেটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন (ডব্লিউএমও)-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, এবছর প্রাক-বর্ষাকাল ভারত ও পাকিস্তানে খুব গরম ছিল। এই গরম আবহাওয়া ফসল উৎপাদন কমে যাওয়ার প্রধান কারণ।

ভারতের ফসল উৎপাদন কমে যাওয়ায় তারা এখন চাল এবং গম রফতানি বন্ধ রেখেছে যা আন্তর্জাতিক খাদ্য বাজারকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। খাদ্য ঘাটতি বাড়ছে। পাকিস্তানে শুধু অগস্ট মাসে স্বাভাবিকের থেকে ২৪৩ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে। বন্যাও হয়েছে। এই বন্যায় সে দেশের মোট ৭৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার প্লাবিত হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ। এছাড়াও ৭৯ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল।

এবারের বর্ষাজুড়ে বিভিন্ন সময়ে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে বন্যা এবং ধ্বস নেমেছিল। এর জন্য প্রাণহানি হয়েছিল ৭০০ জনের। এছাড়া বজ্রপাতের কারণে মারা গিয়েছিল ৯০০ জন। শুধুমাত্র আসামে বন্যার কারণে বাস্তুচ্যুত হয়েছিল ৬ লক্ষ ৬৩ হাজার মানুষ। বাংলাদেশে গত ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল এই বছরে। ৭২ লক্ষ মানুষ এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বাস্তুচ্যুত হয়েছিল ৪ লক্ষ ৮১ হাজার মানুষ। কক্সবাজারে, ভারী বর্ষণে প্রায় ৬০ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী বন্যা কবলিত হয়েছিল।

রাষ্ট্রসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এবং ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট ল্যাব-এ প্রকাশিত রির্পোটে বলা হয়েছে, শতাব্দীর শেষ নাগাদ, প্রাক শিল্প বিপ্লবের সময়ের গড় তাপমাত্রার তুলনায় ভারতের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে।

এই রিপোর্ট অনুসারে, ভারতে বর্তমান গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ২৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা শতাব্দীর শেষ নাগাদ ৩ ডিগ্রি বেড়ে হবে ২৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্যদিকে, দিল্লি এবং আহমেদাবাদের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা বাড়তে পারে ৩.৫ ডিগ্রি আর ফরিদাবাদ এবং জয়সলমেরের বাড়তে পারে ৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুধু তাই নয়, রিপোর্টে বলা হয়েছে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত, বছরের ১৮১ দিন অবধি দেশের গড় তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি থাকবে। এই ক্ষেত্রে, দিল্লিতে বছরের ২১৭ দিন এবং কলকাতায় ১৭৮ দিন তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করবে। একই রকমভাবে দেশের অন্যান্য জায়গার গড় সম্ভাব্য তাপমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এই রিপোর্টে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা এজন্য  স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার কারণে দেশে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় মৃত্যুর হার বর্তমানের থেকে গড়ে ২৩ জন করে বাড়বে। এই সংখ্যা দিল্লিতে ৫৫, ফরিদাবাদে ৬৬, মিরাটে ৭০, জয়পুরে ৫৪, লুধিয়ানায় ৭৯, লখনউয়ে ৫৯, এলাহাবাদে ৮৪, বারাণসীতে ৭৫ এবং জয়সলমেরে ৮১ জন হবে। শুধু তাই নয়, তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে দেশে জ্বালানির ব্যবহার প্রচুর বাড়বে। অনুমান, দেশে মাথাপিছু শক্তি খরচ বাড়বে ১.৩ গিগাজুল। এই রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে, শতাব্দীর শেষ নাগাদ, বছরে কর্মী পিছু গড় কাজের সময় ৬১.৬ ঘন্টা কমে যেতে পারে, যা আয়ের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে।

শুধু তাই নয়, রিপোর্টে বলা হয়েছে, কৃষি, নির্মাণ, খনি এবং উৎপাদক শিল্পগুলি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবে। কারণ এই সবই জলবায়ুর ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। আর তাই আগামী বছরগুলিতে বিশ্বজুড়ে বৈষম্য আরো বাড়বে। রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে, এর প্রভাব অঞ্চলভেদে একই রকম হবে না। আর পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য দেশগুলির কী সংস্থান আছে এবং কতটা সদিচ্ছা রয়েছে, তার উপরও এটি নির্ভর করবে।।

**সারে ভরতুকি আর জলবায়ু বদল** **২৮/২৬**

নাইট্রোজেন (এন), ফসফরাস (পি), পটাশ (কে) এবং সালফার (এস) - এই সমস্ত সারের ক্ষেত্রে মোট ৫১,৮৭৫ কোটি টাকার ভরতুকি দেবে সরকার। ২০২২-২৩-এর রবি মরশুমের ১ অক্টোবর থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই ভরতুকি দেওয়া হবে। সরকার ঠিক করেছে, এই রবি মরশুমে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ এবং সালফার সারের কিলোগ্রাম প্রতি দাম হবে যথাক্রমে ৯৮.০২, ৬৩.৯৩, ২৩.৬৫ এবং ৬.১২ টাকা। এতে সারের জোগান আরো সুলভ হবে বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

সরকার ইদানিং জলবায়ু বদল নিয়ে এত চিন্তিত তবুও রাসায়নিক সারে ভরতুকি দিয়েই চলেছে। তাদের বক্তব্য, দুম করে তো ভরতুকি বন্ধ করা যায় না। তাহলে তো চাষের খরচ অনেক বেড়ে যাবে। আর উৎপাদন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তখন মানুষ খাবে কি? কিন্তু এই আলুর মরশুমে একটু খোঁজ নিলে জানা যাবে সারের আকালের কথা। ফলে সরকারি দামের প্রায় দ্বিগুণ পয়সা দিয়ে, কালোবাজারে সার কিনছে চাষিরা। ভরতুকিতে লাভ হচ্ছে সার কোম্পানির মালিকদের। কালোবাজারিতে লাভ হচ্ছে ব্যবসাদারের। মরছে চাষি। অন্যদিকে জৈব সারের গবেষণা, উৎপাদন, সরবরাহ, ভরতুকি নিয়ে মুখে কুলুপ সরকারের। তাই জলবায়ু বদল নিয়ে এই সরকারের বাগাড়ম্বর সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়।

## নাড়া নিয়ে নাড়াচাড়া ২৮/২৭

শস্যের অবশিষ্টাংশকে না পুড়িয়ে কীভাবে অন্য কাজে ব্যবহার করা যায়, তা নিয়ে একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শ্রী ভূপেন্দ্র যাদব। কেন্দ্রীয় পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এটি তৈরি করেছে। এর ফলে উত্তরপ্রদেশ সহ উত্তর ভারতের যেসব রাজ্যে নাড়া পোড়ানোর জন্য পরিবেশ দূষণের সমস্যা দেখা দেয়, তাদের এই সমস্যার সমাধান করতে সুবিধা হবে। নতুন এই নির্দেশিকা অনুযায়ী শুকনো খড় তৈরির জন্য কেউ যদি শিল্প গড়তে চান, তাহলে তাকে প্রতি ঘন্টায় ১ টন খড় উৎপাদক যন্ত্রের জন্য সর্বোচ্চ ১৪ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে শিল্প গড়ার জন্য সর্বোচ্চ ৭০ লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়া যাবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথা অনুযায়ী, শস্যের অবশিষ্টাংশ - যা নাড়া নামে পরিচিত, তা পোড়ানো বন্ধ করে পরিবেশ দূষণ রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শস্যের অবশিষ্টাংশকে নির্দিষ্ট আকারে কেটে তা গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা অথবা তাকে জ্বালানির কাজে লাগানোর জন্য চাষিদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। এর জন্য চাষিরা যাতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কিনতে পারে, সরকার সে বিষয়েও সাহায্যের পরিকল্পনাও করেছে।

মন্ত্রী জানিয়েছেন, শস্যের অবশেষকে জ্বালানিতে পরিণত করার প্রয়োজনীয় যন্ত্র কেনার জন্য সর্বোচ্চ ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা অনুদান বাবদ দেওয়া হবে। এই কাজে যেসব যন্ত্র প্রতি ঘন্টায় ১ টন জ্বালানি উৎপাদন করতে পারবে সেগুলি কেনার জন্য ২৮ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হবে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৫০ কোটি টাকার তহবিলের সংস্থান করেছে। মন্ত্রক ইতিমধ্যেই ইথানল উৎপাদনের জন্য ১৯০ টি সংস্থাকে পরিবেশগত ছাড়পত্র দিয়েছে। হরিয়ানার পানিপথে ফসলের অবশেষ থেকে ইথানল তৈরির কারখানা থেকে প্রতি বছর প্রায় ২ লক্ষ মেট্রিক টন জ্বালানির উপাদান উৎপন্ন হবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন পরিবেশ মন্ত্রী।

## দাঁতের ব্যথায় লবঙ্গ ২৮/২৮

দাঁতের ব্যথা সহ্য করা খুব কঠিন। বিশেষ করে রাতে এই ব্যথা আরো বাড়ে। এর সঙ্গে মাথাব্যথা হওয়াও খুব স্বাভাবিক। আবার দাঁতে ব্যথা হলে মুখও ফুলে যায়। এই ব্যথা কমাতে একটি ঘরোয়া ওষুধ হল লবঙ্গ। দ্রুত দাঁতের ব্যথা কমাতে লবঙ্গ বেশ কার্যকরী। এতে অনেক পরিমাণে ইউগেনোল নামে একটি পদার্থ থাকে যা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ। ইউগেনোলই সহজেই দাঁতে ব্যথা ও মাড়ির ফোলাভাব কমাতে পারে।

লবঙ্গ দাঁতের গোড়ায় নিয়ে রাখলে ব্যথা কমে তবে একটু সময় লাগে। দ্রুত ব্যথা কমাতে লবঙ্গ তেলের সঙ্গে অল্প পরিমাণ নারকেল তেল অথবা বাদাম তেল মিশিয়ে দাঁতের গোড়ায় লাগিয়ে রাখতে পারেন। লবঙ্গ ভালো করে বেটে নিয়ে সেই মিশ্রণও দাঁতের গোড়ায় লাগিয়ে রাখা যায়। লবঙ্গ জলে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে, তা দিয়ে কুলকুচি করলে দাঁত ব্যথায় উপকার পাওয়া যায়। লবঙ্গ, ইউক্যালিপটাস পাতা ও জোয়ান একসঙ্গে জলে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে কুলকুচিও করতে পারেন। ব্যথার প্রথম দিন থেকেই এটি করতে থাকলে স্বস্তি পাওয়া যায়।

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৭০০ ০৪২ । দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু